বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান

অনুবাদ
আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ইসলামি সভ্যতা থেকে পশ্চিমাবিশ্ব যা নিয়েছে ——আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান	২৩
ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিভেদ অতিক্রম : সভ্যতায় ইসলামের অবদান——লোওয়ে এম. সাফি	২৮
আল মাওয়ার্দির রাজনৈতিক ভাবনা : ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালা——সাইয়্যেদ এ. আহসানি	৫৪
ইউরো-আমেরিকান আইনশাস্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস : ইসলামিক বিকল্প——পিটার এম. রাইট	৭৯
আধুনিক বিজ্ঞানের শিকড় মধ্যপ্রাচ্যে——দিলনেওয়াজ এ. সিদ্দিকি	৯৮
সপ্তম থেকে ষষ্ঠদশ শতকে মুসলিম চিকিৎসক ও অন্যান্য পণ্ডিতদের অবদান——এম. বাশীর আহমেদ	১২৪
আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইসলামি অর্থনীতির উপযোগিতা——মুহাম্মাদ শরিফ	১৫৭
শেষ কিছু কথা——দিলনেওয়াজ এ. সিদ্দিকি	১৮৪

ইসলামি সভ্যতা থেকে পশ্চিমাবিশ্ব যা নিয়েছে

আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান

বর্তমান পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিলে মানবসভ্যতার যে বিস্ময়কর উত্থানের চিত্র ধরা পড়ে, তার নেপথ্যে মুসলমানদের অবদানকেও সচেতনভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং আদর্শের মধ্যে সহমর্মিতার সেতুবন্ধন রচনা করতে গেলেও এই ধরনের পারস্পরিক মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একবার গুগলে সার্চ দিয়ে আমি ৩ লাখ ৬ হাজারটিরও বেশি ওয়েবসাইটের সন্ধান পেয়েছিলাম।[১]

তাওহিদের পতাকাবাহী ইবরাহিম ﷺ-এর উত্তরাধিকারীরা এখন গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এখন স্বীকার করেন, এই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলোই মানব ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।[২] বলা হয়, গোটা পৃথিবীই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। এই বাস্তবতায়, অন্য সব পার্থক্যকে দূরে সরিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে যাওয়াটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে মানুষকে আধ্যাত্মিক চেতনা এবং নৈতিকতার দিকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কেবল তাহলেই মানুষকে তার দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক করা সম্ভব। একটি সমন্বিত চেতনার ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য—শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং ইতিহাসের বিকৃতির কারণে যেসব সংকটের জন্ম হয়, তার সমাধান করা। যদি পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে ইবরাহিম ﷺ-এর উত্তরাধিকারীদেরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।[৩]

আজ অবধি মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো ও কীর্তিমান সব প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে খ্রিষ্টান ও ইসলাম জড়িত থাকলেও এই দুটি চিন্তাধারা ও ধর্ম-দর্শনের বয়ানে পরবর্তী সময়ে

যে বিকৃতি সাধন হয়েছে, তার পরিণতিতেই বিশ্বজুড়ে জন্ম নিয়েছে নানান সংকটের। খ্রিষ্টানরা একদিকে তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং অপরদিকে ন্যায়বিচার ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার নামে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করেছে।

মূলত এই সব কৌশলের মাধ্যমে তারা খ্রিষ্টধর্মের মূল চেতনাকেই করেছে ভূলুণ্ঠিত। পরবর্তী সময়ে আবার খ্রিষ্টানরাই জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করেছে— যা মানুষকে কেবল নিজেদের ভিন্ন অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে শিখিয়েছে। এই ভিন্নতার চর্চা করতে গিয়ে পৃথিবীজুড়ে ঘৃণাবোধ এবং যুদ্ধ-সংঘাতের বিকাশ ঘটেছে। শুধু তা-ই নয়; খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়েছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামই মানুষকে অন্ধকার যুগ থেকে টেনে বের করেছে। শুধু তাই নয়; ইসলাম ব্যাপক জ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভর করে নতুন এক সভ্যতার জাগরণ এবং একত্ববাদের চেতনাকে ধারণ করে গোটা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করার প্রয়াস চালিয়েছে।[৪]

ইসলামের টেকসই আলোকবর্তিকা অন্য ধর্মের মানুষকেও তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রভাবের মাত্রা ছিল এতটাই বেশি, তারা ইসলামের কারণে শুধু ধর্মই পরিবর্তন করেনি; বরং অনেকেই নিজেদের ভাষা ও চিরায়িত প্রথা বা অভ্যাসকেও পালটে ফেলেছিল। মানব ইতিহাসে এ রকম ঘটনার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—উত্তর আরব, উত্তর আফ্রিকা কিংবা পূর্ব আফ্রিকার ভাষা আরবি ছিল না, কিন্তু ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর তাদের ভাষাও আরবি হয়ে যায়। শুধু তাই নয়; মুসলিম মনীষীদের অবদানের কারণেই অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সময় থেকে নতুন একটি উন্নত সভ্যতার ভিত রচিত হয়, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে সূচনা হয় ইউরোপে রেনেসাঁস এবং এনলাইটমেন্ট যুগের।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, ইতিহাসের ক্রমাগত বিকৃতি সাধন করে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদানগুলোকে আড়াল করে ফেলা হয়।[৫] ফলে অন্য ধর্মের মানুষ তো বটেই, এমনকী মুসলমানরাও নিজেদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সেই আলোটিকে হারিয়ে ফেলে। তারা ভোগ-লালসায় মত্ত হয়ে নিজেদের পবিত্র চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তাই কার্যত এখন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই মুসলমানদের তাৎপর্যপূর্ণ কোনো অবদান আর দৃশ্যমান হচ্ছে না।

বৈশ্বিক এই গ্রামটিকে (গ্লোবাল ভিলেজ) যদি আবারও শান্তিপূর্ণ করতে চাই, তাহলে তাওহিদের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের আবারও সেই হারানো বিশুদ্ধতা ও ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলোকে। যদিও জাতিসংঘ যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, তারপরও বাস্তবতা হলো—জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫০ থেকে ২০০০ সাল অবধি বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা আগের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই, শুধু কথাবার্তা বলে নয়; বরং শুদ্ধ চেতনাগুলোকে লালন করার মাধ্যমেই পারস্পরিক ভালোবাসা ও মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে। সর্বপ্রথম ইসলামই ভিন্ন ভিন্ন সব মানুষকে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সবর্জনীন স্বীকৃতি দিয়েছে।[৬] ইসলামই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে ভালো কাজ করার তাগিদ এবং এই ভালো কাজগুলো করার মাধ্যমে পরকালীন জীবনে অনন্ত সুখ ও সফলতা অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।[৬]

খ্রিষ্টানদের মূল যে চেতনা, তা খ্রিষ্টানরা ধারণ না করলেও ইসলাম এও দাবি করেছে—সকল মানুষের সৃষ্টি একক একটি আত্মা থেকেই। মানুষের মধ্যে বাহ্যিকভাবে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাকে কেন্দ্র করে বিবাদে বা সংঘাতে লিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। একজন মানুষ বা একটি গোত্র অপর কোনো মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চাইবে—তা-ও কাম্য নয়। মানুষকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বিবাদের জন্য নয়; বরং পারস্পরিক মতবিনিময়ে জন্য। সবাই যদি একই হতো, তাহলে তো বিনিময়ের প্রয়োজনই পড়ত না।

আমরা যখন নিজেদের ভিন্নতাগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখি, তখনই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গঠনমূলক অবদান রাখতে পারি। প্রকৃতিগতভাবেই কেউ কেউ ইতিবাচক আবার কেউ-বা নেতিবাচক হয়। কেউ পুরুষ হয় আবার কেউ-বা মহিলা। এই ভিন্নতাগুলো এ কারণেই রাখা হয়েছে—যাতে আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে উপকার পেতে পারি।

ইসলাম কখনোই ভাষা বা শরীরের রঙের ভিন্নতাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলে ভাষা ও গায়ের রঙের দোহাই দিয়ে একজনের ওপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

কিংবা কাউকে ছোটো করার বিষয়টিকেও ইসলাম অনুমোদন দেয় না। মূলত এই ভিন্নতাগুলো আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির অনুপম নিদর্শন। তাই ভিন্নতাগুলোকে ইতিবাচকভাবেই দেখা উচিত।

খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম উভয়ই ন্যায়বিচার ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।[৭] আমাদের সব সময়ই সবার প্রতি, এমনকী আমাদের শত্রুদের প্রতিও ন্যায়বিচার করা উচিত। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইসলাম মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকেও নিশ্চিত করেছে। ইসলামের কারণে যেখানেই যুদ্ধ করতে হয়েছে, ইসলাম সেখানেই জনগণকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। যারা এই স্বাধীনতাকে অনুমোদন করেছে, ইসলাম তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে গিয়েছে। আর যারা মানুষের ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে, মুসলমানরা শুধু তাদেরই সেই অপচর্চা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে।

এই পৃথিবীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের শান্তি ও স্বাধীনতার দর্শনের চর্চা করতে হবে। পরস্পরের প্রতি হতে হবে সহনশীল। যখন একজন মানুষ সঠিক কাজটি করতে পারে এবং ভুল কাজটি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই নিশ্চিত হয়। স্বাধীনতা চর্চার মধ্যে যদি নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং মানবতার কল্যাণ না থাকে, তাহলে বরং সেই স্বাধীনতার কারণে সভ্যতার আরও পতন হয়। এ কারণে বিশ্বাসী প্রতিটি সম্প্রদায়েরই এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যাপিত জীবনে ঐশ্বরিক বার্তাগুলোকে ধারণ করার চেষ্টা করা উচিত। সর্বোপরি ভালোবাসা, মায়া, মমতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে জীবনকে অর্থবহ করে তোলা জরুরি।

ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিভেদ অতিক্রম : সভ্যতায় ইসলামের অবদান—লোওয়ে এম. সাফি

সামাজিক অস্তিত্ব এবং মতবিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্তিপর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপিত এবং পারস্পরিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানকে প্রসারিত করতে কিংবা সমাজকে এগিয়ে নিতে ভাষা অত্যন্ত অপরিহার্য একটি উপাদান। আবার এর বিপরীতে এটাও সত্য, ভাষাকে কেন্দ্র করেই বিরোধ ছড়ায়, ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে, সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। ভাষার অপপ্রয়োগে কখনো কখনো এমন শক্তিশালী পরিস্থিতির উত্থান হয়, যা সব ধরনের সামাজিক সংহতিকেও বিনষ্ট করতে পারে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও বিনিময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভাবনা ও আচরণের ওপর ভাষার প্রভাবটি বেশি দৃশ্যমান হয়।

তবে এক্ষেত্রে ভাষা বা সংস্কৃতির মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ আছে। যেমন : কয়েকজন মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ভিন্ন হলে তাদের মধ্যে কি চিন্তার আদান-প্রদান হতে পারে? কেননা, অভিজ্ঞতা আলাদা হলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা হওয়া স্বাভাবিক। তারপরও এই ধরনের তাত্ত্বিক লেনদেন কতটা বাস্তব? ধর্ম ও অভিজ্ঞতার মাঝে যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিদ্যমান, তার ভিত্তিতে ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়ই অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

এই বিষয়গুলোকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাপকাঠিতে ছাড় দেওয়ার কিংবা আদান-প্রদান করার সুযোগ হয়তো কম। সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণে একে অপরকে ভুল বোঝার অবকাশও তুলনামূলক বেশি। তাই কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ওপর যদি ঐতিহাসিক উপাদানগুলোকে মাত্রাতিরিক্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও নানা সংকটের জন্ম দেয়। এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তরসূরিদের উন্নতি ও বিকাশের মাত্রাও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপরিউক্ত জটিলতাগুলো থাকা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি, যেকোনো বোদ্ধা ও চিন্তাশীল মানুষের; বিশেষ করে মুসলিম শিক্ষাবিদ ও চিন্তকদের সাথে অন্যান্য ধারার চিন্তাবিদদের মধ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতাসংক্রান্ত চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক লেনদেন হওয়া প্রয়োজন। একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমার মুসলিম ও পশ্চিমা—দুটো সংস্কৃতিকেই খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি মনে করি, এই দুটো সংস্কৃতিই একে অপরকে জানার ও বোঝার মধ্য দিয়ে ভীষণভাবে উপকৃত হতে পারে। আরও মনে করি, ইসলামিক ও পশ্চিমা সভ্যতার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কতটা শিখতে পারছি এবং এগুলোকে কতটা সফলভাবে কাজে লাগাতে পারছি, তার ওপরই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ কাঠামো অনেকখানি নির্ভর করে।

যদিও কাঠামোগত দিক থেকে ইসলামিক ও পশ্চিমাসভ্যতার মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব, তা সত্ত্বেও এই দুটো সভ্যতাই কিছু সর্বজনীন মূল্যবোধ ধারণ করে। এর মধ্যে অন্যতম—সামজিক ন্যায়বিচার, সমতা, জনকল্যাণ, সমাজকল্যাণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। পশ্চিমা সভ্যতা তার সমাজ কাঠামোকে এমনভাবে নির্মাণ করেছে, তাতে এই মূল্যবোধগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধারণ ও লালন করা হয়। মূল্যবোধগুলোকে তারা ব্যাপক অর্থে সামাজিকীকরণও করেছে। এই সফলতা অর্জনের পেছনে পশ্চিমা সভ্যতাকে দুটো বিব্রতকর ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। একটি সামন্ততন্ত্র এবং অন্যটি সংঘবদ্ধ ধর্মীয় পরিকাঠামো, যা চার্চগুলোর মাধ্যমে আরোপিত হয়েছিল। পশ্চিমাজগতে পরবর্তী সময়ে রেনেসাঁস তথা শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে এই জাতীয় নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়।

আল মাওয়ার্দির রাজনৈতিক ভাবনা : ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালা—সাইয়্যেদ এ. আহসানি

মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা পরাশক্তির আধিপত্য বিস্তারের পর রাজনৈতিক পদ্ধতি নিয়ে ইসলামি চিন্তাবিদদের তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। প্রথমত, যারা আধুনিক চিন্তায় বিশ্বাস করেন, তারা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মডেলটিকে পুরোপুরিভাবে ধারণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে রক্ষণশীলরা মনে করেন, পশ্চিম ধারাকে পুরোপুরিভাবে লালন করতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান ঘটতে পারে। আর সেটা করা কখনোই সমীচীন হবে না। কেননা, ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের মূলনীতিমালার সঙ্গে বরাবরই সাংঘর্ষিক। তৃতীয়ত, আরেকটি ধারাকেও পাওয়া যায়—উদারমনা; তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার পক্ষে থাকছেন। তারা পশ্চিমা ধারণা থেকেও যেমন ইতিবাচক বিষয়গুলোকে নিতে চাইছেন, তেমনিভাবে আবার ইসলামের ঐতিহ্যকেও ধারণ করতে চাইছেন।

এই তিনটি ধারা যে একেবারে নতুন, তা কিন্তু নয়। আব্বাসীয় আমলেও মুতাজিলাদের উত্থান ঘটে। তারা যুক্তিবাদকেই বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করে। তখনও এ রকম তিনটি ধারার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন মনে করতেন, ওহির বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই অকাট্য যুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই যুক্তির প্রভাবে ওহির মূল চেতনা হুমকির মুখেও পড়তে পারে।

মূলত আল মামুনের সেই আশঙ্কা থেকেই দুটো প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর জন্ম হয়। একটি আহলে হাদিস বা সনাতনপন্থি ধারা—যারা যুক্তিকে পুরোপুরিভাবে অগ্রাহ্য করে। আর আরেকটি আশারাইত, যারা ঐশ্বরিক বাণীকে গ্রহণযোগ্য রাখার উদ্দেশ্যে সীমিত আকারে যুক্তির ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নেয়।

পরবর্তী সময়ে যুক্তিবাদীদের নিষিদ্ধ করার পর মাওয়ার্দির এ বিতর্কটিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আহলে হাদিস বা আশারাইত কিছুই ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন মুক্তমনা চিন্তাবিদ, যিনি যৌক্তিক ধর্মতত্ত্বের চর্চা করতেন।

তিনি মনে করতেন, যে বিষয়গুলোতে ওহির সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই, সেখানে যুক্তি প্রয়োগের সুযোগ আছে। মাওয়ার্দির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো—পলিটিক্যাল জাস্টিস বা রাজনৈতিক ন্যায়বিচারসংক্রান্ত ধারণার প্রবর্তন। ইসলামি শরিয়াহর আলোকে তিনিই প্রথম এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

মাওয়ার্দি তাঁর *আল আহকাম আল সুলতানিয়া* নামক গ্রন্থে জনসম্পৃক্ত আইনগুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন—অনেকেরই মনে হতে পারে, পূর্বের শরিয়াহ বিধান দিয়ে বোধ হয় আদল বা ন্যায়বিচার পুরোপুরি রক্ষা করা যাবে না। ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো—ধর্মানুরাগী মুসলিম শাসকরা শরিয়াহকে ধর্মীয় পর্যবেক্ষণের আলোকে বিবেচনা এবং (তৎকালীন আলিম-উলামাদের পরামর্শ অনুযায়ী এর প্রয়োগ করতেন। ফলে আলিমসমাজ সেই সব শাসকদের অনেক পদক্ষেপেই ছিলেন সন্তুষ্ট। মুসলিম শাসকদের ওপর আলিমগণের প্রবল ভরসা থাকায় তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো খলিফার হাতেই ছেড়ে দিতেন। এভাবে চলতে চলতে একটা সময়ে ধর্ম হয়ে যায় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে ধর্মীয় ইসলামের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকাঠামোর সহাবস্থানের যে সুযোগ ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়।[১] সহাবস্থানের এই ধারণাটি রাসূল ﷺ নিজেই সূচনা করেছিলেন। কেননা, তিনি একই সঙ্গে ছিলেন নবি এবং রাষ্ট্রনায়ক।[২]

মদিনার সংবিধান

মদিনা নামক রাষ্ট্রটি ইতিহাসের অন্যতম একটি সফল রাষ্ট্রের নাম। এই মদিনাতেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের অনুগত হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।

মদিনা সংবিধানের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য

১. পূর্বের গোত্রগত যে ধারণা ছিল, তার পরিবর্তে নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে—যার আওতায় সকলেই নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। সকল নাগরিক এমনকী ইহুদি ও মূর্তিপূজারিরাও একক একটি জাতি হিসেবে গণ্য হবে। (অনুচ্ছেদ ২০-এর খ এবং ২৫)

২. রাসূল ﷺ রাষ্টপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন এবং তিনিই চূড়ান্ত আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

৩. সব ধরনের স্বৈরতন্ত্র ও জুলুমের ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে (অনুচ্ছেদ ১৩, ১৫, ১৬, ৩৬ এবং ৪৭)। সাম্য ও সমতাই হবে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান নীতিমালা (অনুচ্ছেদ ১৫, ১৭, ১৯ এবং ৪৫)।

৪. বাধ্যতামূলক চুক্তির যে বিধান আধুনিক আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার সফল প্রয়োগ মদিনা রাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম শুরু হয়। এর ফলে অন্যান্য গোত্র এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো মদিনা সনদের আওতায় চলে আসে।

৫. খুন, অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া, অপরাধের দায় প্রভৃতি বিষয়কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণীত হয়। একই সঙ্গে রহিত করা হয় রাষ্ট্রের ঘোষিত শত্রুদের সাথে ব্যক্তিবিশেষের পৃথক চুক্তি করার পথও। ইহুদিদের যুদ্ধ-সামগ্রী ভোগ এবং যুদ্ধের ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাহ করার সুযোগ দেওয়া হয়। বলা হয়, যারা যুদ্ধব্যয়ে অবদান রাখবেন, তাদের আর জিজিয়া কর দিতে হবে না।

৬. ঐতিহ্যবাহী প্রথা হিসেবে রক্তঋণ (ব্লাডমানি)-সংক্রান্ত আইনটি বহাল রাখা হয়। তবে এক্ষেত্রে যে ধারাগুলো ত্রুটিপূর্ণ এবং নীতিবিরোধী, সেগুলোকে বাতিল করা হয়।

৭. এই সংবিধান একটি পরিপূর্ণ নথি যেখানে আইন প্রণয়ন, প্রতিরক্ষা, নতুন অভিযান, বহিঃশত্রু আক্রান্ত হলে করণীয়, আর্থিক সম্পদ, জাকাত, চুক্তি, পররাষ্ট্রনীতিসহ সকল বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয়।

৮. মদিনার সংবিধানে এমন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আইন প্রণয়ন[৩], বিচার সম্পাদন এবং নির্বাহী পদ্ধতি নামক তিনটি পৃথক বিভাগকে প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো এখন আধুনিক রাষ্ট্র-কাঠামোতেও অনুসরণ করা হচ্ছে।[৪]

ইউরো-আমেরিকান আইনশাস্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস : ইসলামিক বিকল্প—পিটার এম. রাইট

বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা ও সাবেক ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে যে আইনি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আছে। এই অঞ্চলগুলোর আইনি পদ্ধতিতে বেশ কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ উপকরণ রয়েছে, যেগুলো নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না কিংবা তেমন একটা নিরীক্ষাও চোখে পড়ে না। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সাদৃশ্যপূর্ণ উপকরণগুলো নিয়ে কাজ এবং সেগুলোকে গঠনমূলকভাবে বিশ্লেষণ করব। সেইসঙ্গে প্রচলিত এই আইনি পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে সামনে আসা ইসলামি শরিয়াহ নির্দেশিত আইনি পদ্ধতির সাথেও একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

আমাদের আগে কী ছিল, তা জানতে গিয়ে আমরা প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করি। আমরা যে বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত, সেগুলোও অনেক সময় নানা তথ্য আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। তাই কখনো কখনো কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলার চেয়ে বরং আমরা কোন জিনিসটিকে আগে থেকে চিনি বা জানি—তা বলতেই যেন বেশি ব্যস্ত থাকি। ফরাসি চিন্তাবিদ তেজভেতেন তোদোরোভ, তার বিখ্যাত রচনা 'Essay in general anthropology'-তে সর্বপ্রথম এই কৌশলটি অবলম্বন করার কথা বলেন।

এই অধ্যায়ের সূচনায় তোদোরভের এই রচনাকে উদ্বৃত করলাম। কেননা, আমিও আমার জানা চৌহদ্দিকেই ব্যাখ্যা করার কাজে হাত দিতে যাচ্ছি। কারণ, যে বিষয়গুলো স্পষ্ট বা অন্তত আমার কাছে যেগুলোকে স্পষ্ট বলে মনে হয়, অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সেগুলোকে নিয়েও আলোচনা করার জন্য আমি নিজেকে যোগ্য বলে মনে করি না।

তোদোরভের রচনাবলির প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম হলো—*'A Brief Look at the History of Thought'* এই অধ্যায়টি আমাকে নতুন করে কিছু সংকটের মাঝে ফেলে দিয়েছে, যার জন্য আমি তোদোরভের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছি। যদিও হিস্ট্রি বলতে আলাদা করে কোনো হিস্ট্রিকে না বুঝিয়ে সকল ধারার ইতিহাসকেই বোঝায়। তবে তোদোরভ এখানে হিস্ট্রি বলতে সব ইতিহাসকে ইঙ্গিত করেননি। তিনি কেবল ইউরো-আমেরিকান চিন্তাধারার ওপরই আলোকপাত করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তোদোরভ তার প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামের সম্মান রাখতে পারেননি।[১] আর সেই কারণেই আমি বলেছি—আমাদের আগে কী ছিল, তা শনাক্ত করতে গিয়ে আমরা প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করি। এমনকী আমাদের মধ্যে যে বা যারা সবচেয়ে মেধাবী, তারাও এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারেননি।

তারপরও আমি তোদোরভকে ক্ষমা করে দেবো। কেননা, তিনি তার সীমাবদ্ধতাকে বেশ ভালোভাবেই অতিক্রম করে অদ্ভুত কিছু তথ্যকে সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি পরিচিত সীমানার ভেতরেই এমন কিছু বের করেছেন—যা এতদিন দৃশ্যমান ছিল না। যেমনটা তিনি বলেছেন—

> 'কেউ যদি ইউরোপীয় দর্শন-ভাবনাকে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে—যা এই পর্যন্ত খুব কম ব্যক্তিই করতে পেরেছেন, তাহলে মানুষের একটি নতুন সংজ্ঞা তার সামনে এসে উপস্থিত হবে। নতুন এই সংজ্ঞায় মানুষকে একাকী এবং অসামাজিক হিসেবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।'

তোদোরভ তার ইউরোপীয় দর্শন-ভাবনার বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে গিয়ে সমাজবিরোধী কৌশল অবলম্বন করেছেন।